অগণতান্িক শাসকের শাসন কৌশল

আ হ সা ন মো হা ম্ম দ

মানুষ স্বভাবজাতভাবেই স্বাধীনচেতা এবং সকল প্রকার শাসনের বিরোধী। শাাসনের প্রতি তার বিতৃষ্ণার তীব্রতা এতো বেশী যে, বাবা সন্তানকে শাাসন করলে সেটিও অধিকাংশ সন্তান মেনে নিতে পারে না। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, পৃথিবীর অধিকাংশ পুরুষ তাদের প্রায় সকল প্রকার দুরাবস্থার জন্য বাবাকে দায়ী করে থাকে।

এ কারণে জনগণকে শাসন করার জন্য শাসকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করতে হয়। গণতান্িকভাবে নির্বাচিত শাসকদের জন্য কাজটি কিছুটা সহজ। কেননা, তখন একদিকে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি, যারা তাদেরকে ভোট দিয়েছে, তারা নিজেদেরকে শাসন প্রক্রিয়ার অংশ মনে করে। গণতান্িক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের বিষয়টি নিয়মতান্িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে বিরোধীরা প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত যথেষ্ঠ মনোবল সংগ্রহ করতে পারে না। বিরোধী অংশটি যেহেতু তাদের বক্তব্য, প্রতিবাদ ইত্যাদি স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে এবং নির্দিষ্ট সময় পর আবার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের নিশ্চয়তা থাকে, তাই তাদের ক্ষোভ অনেকটা সাথে সাথেই প্রশমিত হয়। পার্লামেন্টের মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট শাসকের জবাবদিহিতা থাকার কারণেও বিরোধীরা শাসন প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে পড়ে।

সমস্যা বাধে অগণতান্িক সরকারের ক্ষেত্রে। জনগণ কেন তাদেরকে শাসক হিসাবে মেনে নিবে? কয়েক শত বছর আগে যখন নিয়মতান্িক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তখন শাসন করা হতো মুলতঃ অস্ত্র-ক্ষমতার জোরে ভয় দেখিয়ে। কোন সম্রাট বা রাজা কোন জনপদ দখল করলে প্রথমে পুর্ববর্তী শাসককে নিষ্ঠুরভাবে ও প্রকাশ্যে হত্যা করার চেষ্টা করতো। প্রকাশ্যে শুলে চড়িয়ে হত্যার রেওয়াজ এ কারণেই গড়ে উঠেছিল। তখন ক্ষমতার পরিবর্তনের অর্থই ছিল পুর্ববর্তী শাসককে সদলবলে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা কিংবা কারাগারে আটকে রাখা।

গণতন্ত্র ও নিয়মতান্িক শাসন, তা সে যে রূপেই হোক, বিস্তৃত হবার সাথে সাথে অগণতান্িক পন্থায় ক্ষমতা দখল ও তাকে টিকিয়ে রাখা যেমন কঠিন হয়ে পড়েছে, তেমনি তার জন্য সোজা পথে না গিয়ে নানা জটিল কৌশলও অবলম্বন করতে হচ্ছে।

১. এক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত কৌশল হচ্ছে, জনগণকে বিভক্ত করে বিভিন্ন অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত রাখা। ‘ডিভাইড এন্ড রুলের’ এ পুরানো কৌশলটি খুবই কার্যকর ভাবে ব্যবহার করা যায় যখন জনগণের মধ্যে তীব্র বিভক্তির উপাদান বর্তমান থাকে। শাসকেরা এ কৌশলের প্রয়োগের ফলে কয়েকটি সুবিধা পেয়ে থাকেঃ

ক. জনসমর্থনসম্পন্ন শক্তিগুলো পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে তাদের শক্তি ও মনোযোগ নিয়োজিত রাখে, ফলে শাসকের বৈধতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ তারা কম পেয়ে থাকে। শাাসকের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনও তারা গড়ে তুলতে পারে না।

খ. বিবাদমান পক্ষগুলোর এক বা একাধিক অংশ ক্ষমতাশীনদের সহায়তায় তাদের বিরোধীদেরকে নির্মুল কিংবা দুর্বল করার মাধ্যমে ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করে থাকে। অগণতান্িক সরকারগুলো

সাধারণতঃ নিজেদেরকে স্বল্পস্থায়ী বলে প্রচার করে। কোন গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করলে, তাদের প্রথম কথা হয়ে থাকে, তারা এসেছে জাতির ক্রান্তিলগ্নে দেশকে কোন একটি মারাত্মক বিপদ থেকে রক্ষা করতে এবং সব কিছু ঠিক হয়ে গেলে তারা রাষ্ট্রক্ষমতা জনগণের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নিবে। ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক পক্ষগুলোর কেউ কেউ তা বিশ্বাসও করে। শাসকেরাও সে পক্ষের আস্থাভাজন হবার চেষ্টা করে থাকে। জনপ্রিয় এক বা একাধিক রাজনৈতিক দলের সমর্থন পেয়ে গেলে স্বৈরাচারকে হটানো অনেকটাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোন কোন রাজনৈতিক দলের এ ধরণের অবস্থানের কারণে এরশাদের স্বৈরশাসন দীর্ঘ হয়েছিল। বর্তমান সরকারও এই সুবিধাটি পেয়েছে।

গ. বিভক্তি খেলায় শাসকেরা সবথেকে লাভবান হয়ে তাকে ছাত্র বিক্ষোভের প্রো-অ্যকটিভ দমনে। স্বাধীনতার আগে ও পরের সকল স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদেরকে অগ্রণী ভুমিকা নিতে দেখা গেছে। নেতারা যখন লাভ-ক্ষতির চুলচেরা অংক কষে নানা চাল চালতে ব্যস্ত থেকেছেন, তখন ছাত্রেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নেমেছে। তখন, হিসাব-নিকাশ আর 'পলি ট্রিক্স' ছেড়ে নেতাদেরকেও তাদের সাথে যোগ দিতে হয়েছে। ফলে, খুব দ্রুত স্বৈরাচারকে উৎখাত হতে হয়েছে।

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন কোনক্রমে দানা বাধলে তাকে দমন করা খুব কঠিন। পুলিশ বা নিজস্ব গুন্ডা নামিয়ে সে আন্দোলনের আগুনে ঘি ঢালা ছাড়া আর কিছু করা যায় না। কিন্তু, পরস্পর বিরোধী গ্রুপগুলোর ছাত্রদেরকে একে অন্যের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে কোন ভাবে দু-একটা লাশ ফেলতে পারলে শাসকদের কেল্লা ফতে। ছাত্রেরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে মারামারিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, একটার পর একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হতে থাকে আর কমতে তাকে শাসকের দুশ্চিন্তা।

বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় জনগণকে বিভক্ত রাখা ও তাদেরকে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়ার এই কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে মুলতঃ দুটি হাতিয়ার সবথেকে ব্যবহৃত হয়ঃ

ক. ধর্মকে ভিত্তি করে বিভক্তি সৃষ্টির কোন প্রাকৃতিক উপাদান বাংলাদেশে না থকলেও ধর্ম প্রায়শঃই এ কাজে ব্যবহৃত হয়। এখানে হিন্দু-মুসলমান, শিয়া-সুন্নী কিংবা উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ দাঙ্গা নেই। তবে রয়েছে একটি শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক বিভক্তি। বিংশ শতাব্দীর একটি বড় সময় ধরে এ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কমিউনিস্ট ও সোসালিস্ট আন্দোলনের ব্যাপকতা, পাকিস্তান আমলে ধর্মকে স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও স্বদেশিকতার বিরুদ্ধে ব্যবহার প্রভৃতি কারণে সমাজের শিক্ষিত এলিট শ্রেণীটি ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে কিছুটা বিরূপ ও উদাসীন হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কিছু গোষ্ঠী তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ বা প্রতিবেশী দেশের সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এক্ষেত্রে কিছুটা উগ্রতাও দেখিয়ে থাকে। অপরদিকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীটি অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক কোন কোন ক্ষেত্রেই স্থান না পেয়ে অতিমাত্রায় রক্ষণশীলতা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে তারা সব সময় ভয়ে থাকে যে, ধর্মের ক্ষতি করে ফেলা হবে এবং সমাজে তাদের যে অতি ক্ষুদ্র স্থানটুকু রয়েছে তাও কেড়ে নেয়া হবে। ফলে এই দুই গ্রুপকে খুব সহজে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া যায়।

অগণতান্ত্রিক শাসকেরা ধর্মকে নিয়ে খেলাটা বেশ সাফল্যের সাথেই খেলে থাকেন। ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধ অংশটিকে উস্কে দিলেই চেইন রিঅ্যাকশন শুরু হয়ে যায়। সম্প্রতি নারী উন্নয়ন নীতিমালায় কিছু সেনসিটিভ ইস্যু যোগ করে শাসকগোষ্ঠী এই খেলাটাই খেলতে চেয়েছে।

খ. মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহারের মাধ্যমে বিভক্তিকে উস্কে দেয়ার বিষয়টি আপাতঃ দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক মনে হলেও বাস্তবতা ভিন্ন। বাংলাদেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি - ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী

উভয়েই মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় ভুমিকা রেখেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। অপরদিকে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা নিজে মাঠে থেকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ঘটনাক্রমে স্বাধীনতার ঘোষণাটি তাঁর মুখ থেকেই জাতি শুনতে পেরেছে। সমস্যাটা এখানেই। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সৃষ্টির সকল কৃতিত্ব একা নিজে নিতে চায়। কাজটি করতে গিয়ে তারা অন্য সকলকে খাঁটো করতে পিছপা হয় না। দলটির আরেকটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের সুচনালগ্নে বঙ্গবন্ধুর রহস্যজনক দ্বিধান্বিত ভুমিকা। তাঁর মার্চ মাসের কার্যাবলী নিরপেক্ষ ও আবেগমুক্তভাবে বিশ্লেষণ করলে এ বিশ্বাস জন্মানো কঠিন নয় যে, তিনি স্বাধীনতার চেয়ে অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার প্রতি বেশী আগ্রহী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভুমিকার মধ্যে যে কিছুটা সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়, তাকে ঢাকতে গিয়ে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা সংগ্রামে জিয়া বা এদেশের সাধারণ মানুষের সকল অবদানই অস্বীকার করে বসে। তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে হেয় করার চেষ্টা করে থাকে। তখন বিএনপিও মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের ভুমিকাকে সংশয়াপন্ন করার চেষ্টা করে। এভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে গৌরবময় ভুমিকা পালনকারী দুটি দল পরস্পরের মুখোমুখি দাড়িয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিভক্তির পিছনে ভোটের সমীকরণটিরও একটা গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রয়েছে। দেশে রাজনৈতিক দল অনেক থাকলেও জনগণ আসলে দুই শিবিরে বিভক্ত। একদিকে রয়েছে সেকুলার শিবির যারা ইন্ডিয়ার বিষয়ে নমনীয় এবং দেশটিকে বন্ধু ভাবতে পছন্দ করে। অপরদিকে রয়েছে জাতীয়তাবাদী শিবির যারা ইন্ডিয়ার আগ্রাসী মনোভাবকে মেনে নিতে পারে না। এখানে ইসলাম ধর্ম সম্ভবতঃ একটা ভুমিকা পালন করে থাকে। ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সমর্থনের প্রায় পুরোটাই পেয়ে থাকে জাতীয়তাবাদী শক্তি। জনসমর্থনের পাল্লা কার দিকে হেলবে - তা নির্ধারণ করতে এই ধর্মভিত্তিক দলগুলো গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। বিগত তিনটি নির্বাচনে দেখা গেছে এই দলগুলো যেদিকে গেছে, ক্ষমতার শিকে তাদের ভাগ্যেই ছিড়েছে।

এ কারণে জাতয়াতাবাদী শক্তি থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে সেকুলার শিবির আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে এই চেষ্টাটি সবথেকে ফলপ্রসু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক ইস্যুকে ভিত্তি করে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, এমনকি আলেম, পীর, মাদ্রাসায় শিক্ষিত অংশের প্রায় সকলেই মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। তাদের সে সময়কার ভুমিকাকে সামনে এনে তরুণদেরকে তাদের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করা হলে তাতে সেকুলার, জাতীয়তাবাদী সকলেরই সমর্থন পাওয়া যায়। শিক্ষাঙ্গনগুলোতে খুব দ্রুত সংঘর্ষ ছড়িয়ে দেয়া যায়। ধর্মভিত্তিক কোন দলের ছাত্রদের সাথে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের যদি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধানো যায়, তাহলে তাদের নেতাদেরকেও সহজে পরস্পর বিরোধী অবস্থানে ঠেলে দেয়া যায়।

জরুরী অবস্থা উঠিয়ে নেয়ার আগে বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে করা হতে পারে যার ফলে প্রকাশ্য রাজনীতির সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলো একে অপরের উপর ঝাপিয়ে পড়বে।

২. সমাজের ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তিশালী এবং শাসন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু শ্রেণীকে অত্যাধিক সুযোগ সুবিধা দেয়ার মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক শাসকেরা তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মন জয় করার চেয়ে কয়েক লাখ মানুষকে বেশী সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের সমর্থন পাওয়া অবশ্যই সহজ। এর তৎক্ষণাৎ ফল শাসকের পক্ষে গেলেও যাদেরকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়, প্রকারান্তরে তাদের বিরুদ্ধে জনগণ বিরূপ ধারণা পোষণ করা শুরু করে।

৩. জনগণকে শাসন করার জন্য প্রয়োজনীয় জনসমর্থন ও আইনগত ভিত্তি না থাকলে শাসকেরা সমর্থনের জন্য বিদেশী শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে পৃথিবীতে দুটি সুপার পাওয়ার থাকাতে এই নির্ভরশীলতার ক্ষতি কিছুটা হলেও কম থাকতো। অর্থাৎ বিদেশী শক্তির উপর নির্ভরশীল হলেও দরকষাকষির ক্ষমতা কিছুটা থাকতো। এখন সে অবস্থা নেই। এদিকে আবার একমাত্র সুপার পাওয়ারের সাথে আঞ্চলিক পাওয়ারের সখ্যতা এখন চরমে। ফলে, জনসমর্থন না থাকার অর্থই হচ্ছে বিদেশী শক্তির হাতের পুতুলে পরিণত হওয়া। যেহেতু বাংলাদেশের নিকট থেকে আঞ্চলিক শক্তিটির দাবীর তালিকা অতিমাত্রায় দীর্ঘ তাই এই সুযোগে সে তার পুরোটাই মিটিয়ে নিতে চাইবে। ধরুন, বড় দুই ভায়ের মাথা ফাটিয়ে তৃতীয় ভাইটি হাজির হলো মোড়লের দ্বারে। তিন ভাই এর পৈত্রিক তালপুকুরটি গলাধঃকরণ করতে মোড়ল দীর্ঘদিন ধরে নানা চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই সুযোগে তালপুকুরটি যে তিন ভায়ের হাতছাড়া হয়ে যাবে তাতে কি সন্দেহ থাকতে পারে?

বিদেশী শক্তি বিশেষতঃ প্রতিবেশী দেশটির সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করা হলে তা রাষ্ট্র ও শাসক - উভয়ের জন্যই মারাত্মক প্ররিণাম বয়ে আনতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশটির পক্ষ থেকে এমন কোন কাজ সম্ভবতঃ করা হয়নি যাতে তাদেরকে বন্ধু ভাবা যেতে পারে। এ দেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্বের প্রতি দেশটি সব সময়েই তাচ্ছিল্য দেখিয়ে এসেছে। দেশটি এমন সব কাজ করেছে এবং দেশটির শীর্ষ ব্যক্তিগণ এমন সব কথা বলেছেন, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকী হিসাবে অনেকে দেখেছেন। কি বাণিজ্য, কি প্রতিরক্ষা, কি সংস্কৃতি - সকল ক্ষেত্রেই দেশটি কেবল নিতেই চেয়েছে, বিনিময়ে কিছুই দেয় নি। একটি স্বাধীন দেশের জনগণকে তারা পাখীর মত গুলি করে দিনের পর দিন হত্যা করে চলেছে। তাদের পণ্যে আমাদের বাজার সয়লাব হয়ে গেছে, অথচ, আমাদের দুএকটি পণ্যও তাদের মার্কেটে ঢুকতে পারছে না। সম্প্রতি চাল নিয়ে দেশটি যা করছে, তা কোন বন্ধুর নিকট থেকে কেউ নিশ্চয় আশা করে না।

বর্তমানের শাসকেরা দেশের মধ্রে যত অজনপ্রিয় হয়ে যাচ্ছেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের ব্যর্থতা যত বেশী প্রকট হয়ে ধরা পড়ছে, তারা ততো ডুবন্ত ব্যক্তির খড় কুটো আকড়ে ধরার মত বেশী করে বিদেশী শক্তির দ্বারস্থ হয়ে তাদের সকল দাবী মেনে নিয়ে টিকে থাকতে চাচ্ছে। ৩৬ বছর ধরে তাদের যে দাবীকে পাত্তা দেয়া হয়নি, এখন মনে হচ্ছে তা চাহিবামাত্র দিয়ে দেয়া হচ্ছে। তারপরও বন্ধুর মন পাবার কোন লক্ষণ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি - প্রভৃতি আন্তর্জাতিক দাদন সংস্থার সকল পরামর্শ সরকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করছে।

পৃথিবী বর্তমানে একটি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে। একমাত্র সুপার পাওয়ারের অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিণামদর্শী আগ্রাসন, দেশটির অর্থনৈতিক মন্দা যা সারা বিশ্বকে প্রভাবিত করেছে, পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস - ইত্যাদি কারণে বিশ্ব একটি অনিশ্চিত ও বিপদজনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তার লক্ষণ প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র এবং অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে দুর্বল দেশে অগণতান্ত্রিক সরকারের সকল শাসন কৌশলই জাতির জন্য মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে।